লোককথায় নারী : লোকজ জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক

শামস আলদীন

লোকসাহিত্য ব্যক্তি ও সমষ্টির সমবেত সৃষ্টি; ব্যক্তির মনে যে ভাবের উদয় হয়, তার অসম্পূর্ণ রূপায়ণকেই সমষ্টি নিজের আদর্শে সম্পূর্ণ করে নেয়। দিব্যজ্যোতি মজুমদার লোককথা সম্পর্কে বলেন—

> রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাষাভাষী এলাকা আজ দ্বি-খণ্ডিত। বাংলার একটি অংশ আজ স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা একই ঐতিহ্য বহন করে চলেছি। তাই লোকসংস্কৃতির আলোচনা কখনই খণ্ডিত বাংলাকে নিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।... লোকসমাজের মন রাষ্ট্রনৈতিক বিভাজনকে কখনই স্বীকার করে না। সেই হিসেবে লোকসংস্কৃতির আলোচনা একসঙ্গে উভয় বাংলাকে নিয়েই করতে হবে।[১]

তিনি বাংলার লোককথাকে নিম্নোক্ত সাতটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন—"১. পশুকথা ২. রূপকথা ৩. পরিকথা ৪. কিংবদন্তী ৫. ব্রতকথা ৬. লোকপুরাণ ও ৭. গীতিকার অন্তর্ভুক্ত কাহিনী।"[২] বাস্তবতার সংশ্লিষ্টতা ছাপিয়ে মহৎ হয়ে ওঠে না কোনো শিল্পই। আর সাহিত্য যেখানে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থেকেই উদ্ভূত, তার কথা বলাই বাহুল্য। অতি জনপ্রিয় শিশুসাহিত্য এবং রূপকথার ঠাকুরমার ঝুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। উপরন্তু আঁতুরঘর নির্মিত হয়েছে সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ছায়ায়। তাই ঠাকুরমার ঝুলিতে মানুষের ও সমাজের রূপায়ণ অবিসংবাদিতভাবেই বাস্তবতাকে ধারণ করে। ঘরে-বাইরে নারীর বিভিন্ন রূপকেই তুলে ধরা হয়েছে এই রূপকথায়।

লোককলার একাধিক শাখা বেয়ে আমরা খুঁজে পাই রূপকথার অস্তিত্ব। 'ফেয়ারী' অর্থে পরি 'সুন্দরী রমণী' পাখির মতো দুটি ডানা সম্বলিত। আমাদের রূপকথায় কদাচিৎ পরির সন্ধান মেলে। সাদা যাদু এবং কালো যাদু এর মতো দুষ্ট পরি ও ভালো পরি এই দুটি স্পষ্ট বিভাজন আছে। তবে সংখ্যাধিক্যে ভাল পরিরা এগিয়ে। এরা ক্লিষ্ট, নির্যাতিত, ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিতদের সহায়তা করে। অসহায় মানুষের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে।[৩] রূপকথার শুরুতেই দেখি, রাজা বিষণ্ণ। কেননা, তিনি সন্তানহীন। রাজবাড়ির নিম্নপদের কর্মীরাও রাজার মুখ সকালে দেখে না, কেননা আঁটকুড়ো রাজার মুখ দেখলে সারাটা দিন খারাপ যাবে। মর্যাদাহত রাজা সিদ্ধান্ত নেন, তিনি বনবাসী হবেন, রাজত্বে আর তাঁর কাজ নেই। কিন্তু সত্য সত্যই আর তাঁর রাজত্ব ত্যাগ করা হয়ে ওঠে না; কেননা ইতিমধ্যে কোনও সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে যায়, যিনি রাজাকে আশ্বস্ত করেন তাঁর সন্তানলাভের ব্যাপারে। সন্ন্যাসী রাজার হাতে তুলে দেন একটি শিকড় বা একটি ফল কিংবা একটি পাখি। সন্ন্যাসীর পরামর্শ মতো রানিদের

সেই শিকড় বা ফল কিংবা পাখির মাংস খাওয়ানো হয়, তাঁরা সন্তানসম্ভবা হন। রাজার মনস্কামনা চরিতার্থতা লাভ করে।[৫] সন্তানহীন রাজার সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা সত্য, সত্য সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল বা শিকড় রানিদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন না করা, বিশেষত ছোটো রানিকে বঞ্চিত করার উদ্যোগ বা অভিসন্ধি তাও সত্য। কেননা মানুষ সাধারণত পরশ্রীকাতর, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়।[৫]

লোকজ জীবনের সঙ্গে নারীর রয়েছে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। লোকজ জীবনের দৈনন্দিন নানা আচারের সঙ্গে নারী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য লোককথায় নারী নানাভাবে এসেছে—

১. শোষিত ছোটোরানি, ২. অত্যাচারী বড়ো রানি, ৩. নিষ্ঠুর বিধাতা, ৪. উপকারী পাখি, ৫. ঘুমন্ত রাজকন্যা, ৬. সোনার কাঠি রুপার কাঠি, ৭. অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা, ৮. দাসীর বেশে রানি, ৯. রানির বেশে রাক্ষসী, ১০. অর্থলোভী স্ত্রী, ১১. প্রতিবাদী নারী।

বাঙালির হাসির গল্প জসীমউদ্দীনের অন্যতম লোককথার সংকলন। তিনি এখানে আমাদের আবহমান বাঙালি সমাজে নারীর সহজ সরল রূপটি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনিভাবে আবহমানকাল ধরে অবহেলিত নারীর নানা রূপকেও তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকটি গল্পে কোনও না কোনো প্রসঙ্গে নারী এসেছে। এতে ফুটে উঠেছে নারী জীবনের নানা হাহাকার, না পাওয়ার বেদনা, অল্পতে তুষ্ট থাকার প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়।

'গোপ্যার বউ' গল্পে দেখা যায় যে, গোপ্যা নামক এক ব্যক্তি ছিল; যার কাজ ছিল আজগুবি আজগুবি গল্প তৈরি করা। এজন্য তাকে নিয়ে লোকে হাসি তামাশা করলেও সে কিছু মনে করতো না। কিন্তু তার স্ত্রী তো কোনো অন্যায় করেনি। তারপরও স্বামীর আজগুবি গল্পের টিটকারির ভার তাকে নিতে হয়। লোকের জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে গোপ্যার বউ স্বামীকে বলে যে, 'এই যে পাড়ায় পাড়ায় মিছা আজগুবি গল্প বানাইয়া বানাইয়া বলিয়া বেড়াও, লোকের টিটকারিতে ত আমি ঝালাপালা হইয়া পড়িলাম। আমাকে যে দেখে সে-ই বলে, ওই গোপ্যার বউ আসিল।'[৬] এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, গল্পের নাম 'গোপ্যার বউ' এবং গল্পের কোথাও গোপ্যার বউয়ের আসল নাম নাই। তার পরিচয়ই হলো গোপ্যার বউ। এখানে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব খুব ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজে একজন নারীর বিভিন্ন পরিচয় থাকলেও পুরুষের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিচয় আছে। একজন নারী ছোটোকালে অমুকের মেয়ে, বিয়ে হলে অমুকের বউ, আর বুড়ি হলে অমুকের মা। এসব পরিচয়ের আড়ালে তার আসল পরিচয় আর থাকে না। 'গোপ্যার বউ' নামক গল্পেও আমরা এই ধরনের মনোভাব দেখি।

আবার প্রতিবাদী নারী চরিত্রের দেখাও লোককথাগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি একটি গল্প 'আয়না'। এই গল্পে আয়নাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় তা আমাদেরকে প্রতিবাদী নারী চরিত্রের মুখোমুখি দাঁড় করায়। লক্ষণীয় বিষয় যে, তৎকালীন সময়ে নারী তার স্বামীকে মারার জন্য ঝাঁটা নিয়ে প্রস্তুত থাকা দূরের কথা স্বামীর নামটাও পর্যন্ত মুখে আনে না। অথচ এই গল্পে স্বামীকে সতীন নিয়ে আসার জন্য স্ত্রী মারার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। 'আয়না' গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে সেই সময়কে কেন্দ্র করে যখন আমাদের দেশে কোনো আয়নার প্রচলন ছিল না। মাঝে মাঝে কাবুলিওয়ালারা এগুলো

বিক্রি করতে নিয়ে আসতো। কিন্তু তা সাধারণ জনগণের জানার পরিধির মধ্যে ছিলো না। তাই আয়না সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষেরই জ্ঞান ছিল না। কৃষকের ছেলে মাঠে ধান কাটতে গিয়ে আয়নাটা পায়। ভালো করে পরিষ্কার করে দেখে যে আয়নায় তার পিতার মুখ দেখা যায়। পিতা দীর্ঘদিন মারা গেছে এবং এতদিনে পুত্রের মুখের চেহারা পিতার মতো হয়েছে। এর আগে সে কখনো আয়না দেখেনি। সে নিজের ছবিকে পিতা মনে করে আয়নাটাকে যত্ন করে রাখে। অন্যদিকে তার স্ত্রী সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যখনই দেখে যে আয়নাতে একটি মেয়ের ছবি দেখা যাচ্ছে তখন সে তাকে তার সতীন মনে করে। এবং সে স্বামীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ঝাঁটা হাতে ফুলতে থাকে—"আসুক আগে মিনসে বাড়ি। আজ দেখাইব এর মজা!" একটি ঝাঁটা হাতে লইয়া বউ রাগে ফুলিতে লাগিল; আর যে যে কড়া কথা সোয়ামিকে শুনাইবে, মনে মনে আওড়াইয়া তাহাতে শান দিতে লাগিল।[৭]

স্বামী বাড়িতে ফিরলে তাকে নানা গালিগালাজ করতে থাকে এবং চিৎকার করে বলে, "ওরে গোলাম, তোর এই কাজ একটা কাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিস" এই বলিয়া আয়নাখানা চাষীর সামনে ছুড়িয়া মারিল।"[৮] চাষি যতই আয়নার মধ্যে তার পিতা থাকার কথা বলে সে ততই রেগে যায়। এক পর্যায়ে সে রেগে গিয়ে বলে, "ওরে গোলাম! ওরে সফর! তবু বলিস তোর বাজান! তোর বাজানের কি গলায় হাসলি, নাকে নথ আর কপালে টিপ আছে নাকি।"[৯] আয়নার ব্যবহারজনিত পরিচয় না থাকার ফলে আয়নায় প্রতিফলিত নিজেদের মুখ অন্য কারও বলে মনে করাতে এখানে হাসির উদ্রেক ঘটেছে এবং ফলত চাষি ও চাষি বৌ-এর মধ্যে অযথা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এই একটা নিছক আয়নাকেই কেন্দ্র করে।[১০]

'নাপিত-ব্রাহ্মণ' গল্পে দুই মেয়েকে এক ছেলের সঙ্গে বিয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ছেলেটি আবার ভণ্ড ব্রাহ্মণ। আগে নাপিত ছিল। ব্রাহ্মণের পেছন পেছন ঘুরে সে অনেক মন্ত্র শিখেছে। এখন নিজেই ভিন দেশে গিয়ে পুরোহিতের কাজ শুরু করে দিয়েছে। যে কোন ছলনা বা কপটতা দুর্গতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এ গল্প তারই প্রমাণ।[১১] সুব্রত চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেন—"এই গল্পে তাঁতশিল্পের করুণ অবস্থায় তাঁতিরা যে ক্ষতিগ্রস্ত তা তুলে ধরা হয়েছে। আবার অপরদিকে অতিরিক্ত জেদ মানুষকে যে কোনো বিপাকে ফেলে সেটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।"[১২] "বাঙালি নাকি করুণরসের ভক্ত। কাঁদতে পেলে সে আর কিছু চায় না। কান্নায় বুক ভাসাতে তার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু বাঙালি যে হাসতেও পারে, হাস্যরসেও তার আসক্তি এসব গল্পই তার প্রমাণ। প্রসন্নতা এবং জীবনাসক্তি ব্যতিরেকে পবিত্র হাস্যরস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।"[১৩] আর এসবের মধ্যে ছড়িয়ে আছে নারী জীবনের নানা চালচিত্রের বর্ণনা।

'ঠাকুরমার ঝুলি' বাংলা লোককথার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এখানে নারীকে আমাদের আবহমানকালের সমাজজীবনের প্রেক্ষিতেই দেখা হয়েছে। নারীর শত্রু নারী তা এই গল্পগ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। এই দিকটা আমাদের আবহমানকালের সমাজজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে সেরকম একটি চিত্র দেখতে পাই যেখানে নিঃসন্তান রাজার স্ত্রীগণ ব্রাহ্মণের দেওয়া ওষুধ খেয়ে সন্তান জন্ম দিলেও দুই রানি ওষুধের ভাগ না পেয়ে পানি দিয়ে চেটে খাওয়ার ফলে পেঁচা আর বানর জন্ম দেওয়ার কাহিনি দেখি।

এখানে সতীনে সতীনে চিরাচরিত যে ঈর্ষা সেই কাহিনিই তুলে ধরা হয়েছে—

> বড় রানির কথাই সত্য, ন-রানির পেটে এক পেঁচা, আর ছোটো রানির পেটে এক বানর হইল।... যাইতে যাইতে বুদ্ধু পাতাল-পুরীতে গিয়া দেখিল, এক মস্ত সুড়ঙ্গ। বুদ্ধু সুড়ঙ্গ দিয়া, নামিল। সুড়ঙ্গ পার হইয়া বুদ্ধু দেখিল, এক যে রাজপুরী। যেন ইন্দ্রপুরীর মত! কিন্তু সে রাজ্যে মানুষ নাই, জন নাই, কেবল এক একশ বচ্ছুরের বুড়ি বসিয়া একটি ছোট কাঁথা সেলাই করিতেছে। বুড়ি বুদ্ধুকে দেখিয়াই হাতের কাঁথা বুদ্ধুর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। অমনি হাজার হাজার সিপাই আসিয়া বুদ্ধুকে বাঁধিয়া-ছাদিয়া রাজপুরীর মধ্যে লইয়া গেল। নিয়া গিয়া, সিপাইরা, এক অন্ধকুঠুরীর মধ্যে "বুদ্ধু ভাই, বুদ্ধু ভাই, আয় ভাই" বলে অনেক লোক বুদ্ধুকে ঘিরে ধরল। বুদ্ধু দেখিল, রাজপুর আর মাল্লারা, মাঝিরা।... বুদ্ধু বলিল, বটে! তা, আচ্ছা।[১৪]

পেঁচা আর বানর জন্ম দেওয়ার কারণে দুই স্ত্রীকে রাজদরবার থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাদেরকে চিড়িয়াখানার বাঁদী আর ঘুঁটে কুড়ানি দাসীর কাজ করতে হয়। এভাবে তারা বাস করতে থাকে। তারা দুই ভাই তাদের দুই মাকে খুব যত্ন করতে থাকে। এত কষ্টের মধ্যেও সন্তান নিয়ে তারা সুখে বাস করতে থাকে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস এক সময় যারা দরবারে রাজরানির মতো ছিল, আজ তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী সতীনে সতীনে দ্বন্দ্ব। ভুতুমের মা চিড়িয়াখানার বাঁদী, বুদ্ধুর মা ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী। কোনোদিন খাইতে পায়, কোনোদিন পায় না। বুদ্ধু দুই মায়ের জন্য বন জঙ্গল হইতে কত রকমের ফল আনে। ভুতুম ঠোঁটে করিয়া দুই মায়ের পান খাইবার সুপারি আনে। এই রকম করিয়া ভুতুম, ভুতুমের মা, বুদ্ধু, বুদ্ধুর মা'র দিন যায়।[১৫]

এই গল্পে বাঙালি নারীর কাজ ভাগ করে নেওয়ার দৃশ্যকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দৃশ্য আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিশেষ করে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেসব পরিবারের সতীনের সংসার তাদের কাজকে স্বামী ভাগ করে দেয়। এই গল্পও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়—

> রানিরা মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া, কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া, গা-মাথা শুকাইয়া, সকলে পাকশালে গেলেন। আজ বড় রানি ভাত রাঁধিবেন, মেজরানি তরকারি কাটিবেন, সেজরানি ব্যঞ্জন রাঁধিবেন, ন-রানি জল তুলিবেন, কনে রানি যোগান দেবেন, দুয়োরানি বাটনা বাটিবেন, আর ছোটরানি মাছ কুটিবেন। পাঁচ রানি পাকশালে রহিলেন, ন-রানি কুয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটোরানি পাঁশগাদার পাশে মাছ কুটিতে বসিলেন।[১৬]

এ প্রসঙ্গে মো. শহীদুর রহমান বলেন—গ্রামের সংগতি সম্পন্ন গৃহস্থরাই তাদের সম্পত্তি রক্ষা ও সম্পদ আহরণের কাজে যোগান দেওয়ার জন্যই মূলত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতো এবং স্ত্রীদের সংসারের এক একটি দায়িত্ব এক এক স্ত্রীকে প্রদান করতো। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, মানুষ যখন শিকার সভ্যতা পেরিয়ে কৃষিসভ্যতায় পদার্পণ করে স্থায়ী বসবাসের জন্য গৃহী হয়েছে, তখনই তাদের কাজকর্ম এবং সম্পদ রক্ষার্থে জনবলের প্রয়োজন হচ্ছে। আর এই জনবল বাড়াতে তাদের একাধিক বিয়ে করার প্রয়োজন হচ্ছে। অবশ্য সমাজে বহুবিবাহের নানাবিধ কারণের মধ্যে এটি একটি। তবে একাধিক বিয়ে-সাদিতে সতীনে সতীনে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এ দ্বন্দ্ব প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হয়ে হত্যাযজ্ঞের কারণ হয়েও

দেখা দেয়। এ কাহিনিতে হত্যাযজ্ঞ সৃষ্টি না হলেও ন-রানি ও ছোটোরানিকে সতীনের প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছে এবং সন্ন্যাসীর অলৌকিক ঔষধে বানর ও পেঁচা জন্মদানের কারণে সংসারচ্যুত ও চিড়িয়াখানার বাঁদী-দাসী হয়ে সমাজের নির্যাতিত নিম্নশ্রেণিভুক্ত মানুষে পরিণত হতে হয়েছে। ভুতুমের 'মা' ন-রানি হয়েছে চিড়িয়াখানার বাঁদী, আর বুদ্ধুর মা ছোটোরানি হয়েছে ঘুঁটে কুড়ানি এবং এভাবেই সমাজে পতিত হয়ে তাদের পেশাও নির্ধারিত হয়ে গেল নিম্নশ্রেণির।[১৭]

রানির ছেলেরা কলাবতী রাজকন্যাকে আনতে যাবে। এজন্য যে আচার পালন করা হয় তা এখনো আমাদের বাঙালি সমাজে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিদ্যমান। ধান, দূর্বার ব্যবহার বাঙালি জীবনের অনুষঙ্গ। বাঙালি নারীরা সন্তানের মঙ্গল কামনা করে ধান, দূর্বা ব্যবহার করে থাকেন। তেমনি একটি দৃশ্য দেখা যায় 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে। "রানিরা ধান-দুর্বা দিয়ে, পঞ্চদীপ সাজিয়ে, শাঁখ শঙ্খ বাজিয়ে কলাবতী রাজকন্যাকে বরণ করে ঘরে তুললেন।"[১৮]

'ঘুমন্তপুরী' গল্পে ঘুমন্ত রাজপুরীর জেগে ওঠার যে কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রাক্ষসের ছদ্মাবরণ বর্ণিত হলেও আসলে আমাদের আবহমান বাঙালি জীবনের চিত্রই যেন বর্ণিত হয়েছে। আমাদের চোখে রাজকন্যা যেমন হয় ঠিক তেমনিভাবে তাকে তুলে ধরা হয়েছে। রাজ পরিবেশের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা আমাদের চির পরিচিত পরিবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঁদী, দাসী প্রভৃতি চরিত্রগুলো রাজদরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই গল্পে আমরা সেই রকম কিছু চিত্র দেখি। চারিদিকে ফুল-বৃষ্টি, চারিদিকে চন্দন-বৃষ্টি, ফুল ফোটে, খৈ ছোটে, রাজপুরীর হাজার ঢোলে ডুম-ডুম কাটি পড়ল। তখন, শতে শতে বাঁদী দাসী বাটনা বাটে, হাজারে হাজারে ধাই দাসী কুটনা কোটে; দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গল ঘড়া পাঁচ পল্লব ফুলের তোড়া, আলপনা বিলিপন, এঁয়োর ঝাঁক পাঠ পিঁড়ি আসন ঘিরে, বেজে ওঠে শাঁখ। "সেকি শোভা! রাজপুরীর চারচত্বর দলবল ঝলমল। আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় হুলুধ্বনি, রাজভাণ্ডারে ছড়াছড়ি; জনজনতার হুড়াহুড়ি এতদিনের ঘুমন্ত রাজপুরী দাপে কাঁপে, আনন্দে তোলপাড়।"[১৯]

'কাঞ্চনমালা' গল্পটি ভিন্ন ধরনের স্বাদ নিয়ে আসে। রাখাল আর রাজপুত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্র ধরে গল্পের কাহিনি সামনের দিকে অগ্রসর হয়। বাঙালি নারীর লোকশিল্পের প্রতি যে আকর্ষণ, সেই দিকটি এই গল্পে যেমন ফুটে ওঠে তেমনিভাবে এখানে উঠে এসেছে নানা জাতের পিঠা তৈরির কথা। কিন্তু এই পিঠা তৈরিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। যে প্রকৃত রানি সে ভালো ভালো পিঠা তৈরি করে। অন্যদিকে যে রানিকে দাসী বানিয়ে নিজে রানি সেজে বসে আছে, তার পিঠা সমাজের নিচুশ্রেণির মানুষের তৈরি পিঠা। এর ফলে আমরা দুই শ্রেণির বাঙালি সমাজের পরিচয় পাই। আর এভাবে ঘটনার আসল রহস্য উন্মোচিত হয়। রাজপুরীতে গিয়ে মানুষ রানিকে বলল, "রানিমা, রানিমা, আজ পিট-কুড়নির ব্রত, রাজ্যে পিঠা বিলাতে হয়।"

> রানি আহ্লাদে আটখান হইয়া বলিলেন, "তা কেন, হইল হইল দাসী,' দাসীও আজ পিটা করুক।" তখন রানি আর দাসী দুইজনেই পিটা করিতে গেলেন।... মানুষ বুঝিল যে, কে রাণী আর কে দাসী।[২০]

'সাত ভাই চম্পা' গল্পটিতে অলৌকিক কাহিনি বর্ণিত হলেও এর মাধ্যমে বাঙালি নারীর দুঃখ-কষ্টকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজার সাত রানির মধ্যে সাতটি রানির নানা

চরিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোনও রানি অহংকারী, কোনও রানি ঈর্ষাপরায়ণ এসব নানামাত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। আর এভাবে আমাদের বাঙালি নারী সমাজের চিত্রই যেন উঠে এসেছে।

নিঃসন্তান রাজা ছোটো রানির গর্ভে সন্তান এসেছে জেনে তাকে আলাদাভাবে যত্ন নিতে শুরু করলেন। কিন্তু অন্য রানিদের প্ররোচনায় ছোটো রানিকে উপস্থাপন করা হলো ব্যাঙ আর ইঁদুরের জন্মদাত্রী হিসেবে। আর তার গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানগুলোকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হল। অবশেষে গল্পের শেষে এসে সন্তানগুলোকে পুঁতে ফেলার স্থান হতে যে ফুল জন্মে সেটা আনতে গিয়ে আসল রহস্য উন্মোচিত হয়। রাজা অন্য রানিদের তাড়িয়ে দিয়ে ছোটোরানি এবং তার সন্তানদের নিয়ে সুখে বাস করতে শুরু করে।

ছোটোরানির হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেঁড়া কাপড়, তাই নিয়ে তিনি ফুল তুলতে গেলেন। অমনি সুর সুর করে চাঁপারা আকাশ থেকে নেমে আসল। পারুল ফুলটি গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশল। ফুলের মধ্যে থেকে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মতো সাত রাজপুত্র এক রাজকন্যা "মা মা" বলে ডেকে, ঝুপ ঝুপ করে ঘুঁটে কুড়ানি দাসী ছোটোরানির কোলে-কাঁখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সকলে অবাক! রাজার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে গেল। বড়োরানিরা ভয়ে কাঁপতে লাগল। রাজা তখনি বড়োরানিদেরকে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলতে আজ্ঞা দিয়ে সাত রাজপুত্র, পারুল মেয়ে আর ছোটোরানিকে নিয়ে রাজপুরীতে গেলেন।[২১]

সতীন কেবল সতীনের ছেলেকে সহ্য করতে পারে না এমন নয়। বরং সতীনের ছেলের অমঙ্গল কামনায় নানা ধরনের আচারের প্রচলন গল্পগুলোর মাধ্যমে জানতে পারি। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের গ্রামীণ জীবনেও এর প্রচলন দেখা যায়। সতীনের ছেলেকে নানাভাবে ক্ষতি করার জন্য কবিরাজের দ্বারস্থ হতে দেখি। এ যেন আমাদের আবহমানকালের বাঙালি নারীর রূপ। তেমনি একটি চিত্র আমরা 'শীত বসন্ত' গল্পে দেখতে পাই। মুলত এখানে হিংসা-ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় নেওয়াকে মুখ্য করে তুলে ধরা হয়েছে।[২২]

তিনরাত যেতে যেতে সুয়োরানির পাপে রাজার সিংহাসন কেঁপে উঠল। অল্প দিন যেতে না যেতে রাজার রাজ্য গেল, রাজপাট গেল। সকল হারিয়ে, খুইয়ে, রাজা আর সুয়োরানির মুখ দেখলেন না; রাজা বনবাসে গেলেন। সুয়োরানির যেখানে যায়, সেখানেই সবাই তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখে ও বিতাড়িত করে। ফলে দেখা যায়, তিন ছেলে নিয়ে সুয়োরানি চোখের জলে ভেসে পথে পথে ঘুরতে থাকে।[২৩] গল্পের শেষ দৃশ্যে এসে দেখি সুয়োরানির ঈর্ষায় টিয়া পাখি হয়ে যাওয়ার ফলে শীত বসন্তের মা আসল রূপে ফিরে আসে। তখন স্নেহময়ী মা তার সন্তানদের নাম ধরে ডাকে। সন্তানরা মায়ের কাছে ফিরে যায়। সুয়োরানির তিন সন্তান এবং রাজাও ফিরে আসে। তাদের এই মিলনমেলা গল্পে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—স্বর্গের দেবীর চোখ ছলছল, রাজকন্যাকে চুমু খেয়ে চোখের জলে ভেসে স্বর্গের দেবী ডাকলেন, "আমার শীত বসন্ত কৈ রে!" রাজ সিংহাসন ফেলে শীত উঠে দেখে মা সামনে দাঁড়িয়ে; অনুরূপে বসন্ত উঠে দেখে, সামনে মা। সুয়োরানির ছেলেরা দেখে—এই তাঁদের দুয়ো মা। সকলে দ্রুত ছুটে আসে। তখন রাজপুরীর সকলে একদিকে চোখের জল

মোছে, আর একদিকে পুরী জুড়ে বাদ্য বাজে। শীত বসন্ত বলে, "আহা, এ সময় বাবা আসতেন, সুয়ো-মা থাকতেন!"[২৪] এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, সতীনে সতীনে যত দ্বন্দ্বই থাক না কেন সতীনের ছেলেদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বই নেই। কাহিনির শেষেও আমরা এই দিকটা লক্ষ করি। এগুলো মূলত আমাদের বাঙালি জীবনের অনুষঙ্গ।

'কিরণমালা' গল্পে সতীন না হলেও আপন বোন বোনকে ঈর্ষা করে সতীনের মতো আচরণ শুরু করে। এর মাধ্যমে একটি বিশেষ দিক প্রতিফলিত হয় যে, সমাজে নারী নারীর ভালো সহ্য করতে পারে না। ফলে বোনের প্রতিহিংসায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছোটোবোন মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। "হিংসুটে দুই বোন মনের সুখে হেসে গলে, পানের পিক ফেলে, নিজের নিজের বাড়ি যায়। রাজ্যের লোকেরা ডাকিনী রানিকে উল্টো গাধায় উঠিয়ে, মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে রাজ্যের বাইরে বের করে দেয়।"[২৫] বড়ো বোনদের কারণে ছোটোবোনকে ডাকিনী মনে করে তার ওপর নেমে আসে নির্মম নির্যাতন। কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা ও কাঠের পুতুল জন্ম দেওয়ার কারণে তাকে এই অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

'নীলকমল ও লালকমল' নামক গল্পে রাজার স্ত্রীকে রাক্ষসী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে এই রাক্ষস বলতে গল্পে খারাপ চরিত্রের নারীকে মনে করা হয়েছে। অপরদিকে রাক্ষসের মাংস খাওয়ার প্রসঙ্গেও নানা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। এই মাংস খাওয়ার প্রতীকি অর্থও থাকতে পারে। আবার এই মাংস খাওয়াকে আমাদের ক্যানিবাল সংস্কৃতির অংশ মনে করা যেতে পারে। বরুণকুমার চক্রবর্তী বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরেছেন—আপাত অর্থে রাক্ষস চরিত্রটি অসম্ভব বলে মনে হবে; কিন্তু এটি মোটেই অবাস্তব চরিত্র নয়। নৃতাত্ত্বিকেরা যাকে cannibal বলেন, এটি হলো তাই। 'The ogre is nothing but the dead, who has been variously imagined by different people.' পৃথিবীর বুকে নরমাংস আহারকারী, সভ্যতার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা আদিবাসীদের সন্ধান আজ আর মিলবে না। রূপকথার রাক্ষস তার রূপ পরিবর্তনে পটু শুধু তাই নয়, তার প্রাণ থাকে এমন সুরক্ষিত, যা সহজে বিনাশ হবার নয়।[২৬] তবে মো. শহীদুর রহমান বিষয়টাকে এভাবে দেখেছেন—

> গল্পে খোক্ষসের শাখা কাহিনিটিও আজগুবি। কিন্তু তার মধ্যেও সভ্য সমাজের উপর রাক্ষস সদৃশ বিজিত আগ্রাসী মানুষের বর্বরতা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সভ্যতা সমন্বিত হয়ে এগিয়ে চলছে বলে রাক্ষসের সন্তান নীলৎপল ও মানুষের সন্তান লাল কমলের মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে। উপরন্তু এখানে বিজাতীয় সভ্যতার অনগ্রসরতা প্রমাণিত হয়েছে এবং বাঙালি সভ্যতা গ্রহণ-বর্জন নীতিতে চিরন্তন গতিশীলতা রক্ষা করেছে।[২৭]

'সোনার কাঠি রুপার কাঠি' গল্পে আমরা দেখি রাজ্যের সকলকে রাক্ষসেরা খেয়ে ফেললেও রাজকন্যাকে তারা আদর-যত্নে রেখেছে। কিন্তু তাকে বিশ্বাস করতে পারে না বলে সোনার কাঠি আর রুপার কাঠির সাহায্যে তাকে একবার জীবিত করে আর একবার মৃত করে। তারপরও তার প্রতি ভালোবাসার কারণে তাকে খায়নি। সেই রাজ্যে রাজপুত্র গিয়ে তাকে জীবিত করলে সে রাজপুত্রকে বলেছে—

> এই পুরী আমার বাপের; রাক্ষসেরা আমার বাপ-মা রাজ-রাজত্ব খেয়েছে, কেবল আমাকে রেখেছে। যদি আমি পালিয়ে যাই সেইজন্য বাইরে যাইবার সময় রাক্ষসেরা সোনার কাটি রুপোর কাটি দিয়ে আমাকে মেরে রেখে যায়।[২৮]

'সুখু আর দুখু' গল্পের কাহিনিতে দেখি তাঁতি এবং তাঁতির বউয়ের জীবনের নানা অনুষঙ্গ। তাঁতীর দুই স্ত্রী এবং দুই স্ত্রীরই একটি করে কন্যা আছে। তাঁতি বড়ো স্ত্রীর কন্যা সুখুকে বেশি আদর করত এবং ছোটো স্ত্রীর কন্যা দুখুকে আদর করত না। পিতার আদর পেয়ে সুখু মনের সুখে সংসারের কোনো কাজ না করেই থাকত। অন্যদিকে দুখু আর দুখুর মা সংসারের এত কাজ করে বিনিময়ে একটু ভাত আর গঞ্জনা পেতে থাকে। অন্যান্য গল্পগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এই গল্পটা একটু ভিন্ন ধরনের। সাধারণত সংসারের ছোটো স্ত্রী এবং তার সন্তানেরা বেশি আদর পেয়ে থাকে। কিন্তু এই গল্পে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমাদের সমাজজীবনেও এই ধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা যায়। গল্পে সেই দিকের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে স্বামী মারা যাওয়ার পর বড়ো স্ত্রী স্বামীর সব সম্পত্তি হাত করে নিয়ে আরামে আয়েশে ভালোমন্দ খাওয়া শুরু করে। ছোটো স্ত্রীর আগের মতোই পরিশ্রম করে কোনোরকমে দিন চলে যাচ্ছিল। তাঁতি মরে গেলে বড় বউয়ের আচরণকে গল্পে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে—"তাঁতি মরে গেলে। বড়ো তাঁতি বউ তাঁতির কড়ি পাতি যা' ছিল সব লুকিয়ে ফেলে, আপন মেয়ে নিয়ে, দুখু আর দুখুর মাকে আলাদা করে দেয়।"[২৯]

বাঙালির সুতো কেটে নিজস্ব পোশাক তৈরি করার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি নিজের প্রয়োজনে নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্র তৈরি করেছে। এছাড়া সেই বস্ত্র আমদানি করার রেকর্ডও আছে। সেই রকম একটি দৃশ্য এই গল্পে বুড়ির সুতো কাটার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। "বাড়ীতে আর কেউ নেই; ফিটফাট ঘর দোর, ঝক ঝক আঙিনা কেবল দাওয়ার উপরে এক বুড়ী বসে বসে সুতো কাটছে, সেই পলকে পলকে জোড়ায় জোড়ায় শাড়ি হচ্ছে।"[৩০]

'দেড় আঙ্গুলে' গল্পে কাঠুরিয়ার জীবনের গল্প আলোচনা করা হয়েছে। সন্তানের জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আচার পালনের ইতিহাস বাঙালির চিরদিনের। সেই দিকের প্রতিই এই গল্পে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কাঠুরিয়ার বউয়ের আচারব্রতকে গল্পে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে—"কাঠুরিয়া বউ আচারনিয়ম ব্রত উপোস করে, মা-ষষ্ঠীর-তলায় হত্যা দেয়। 'জন্মে জন্মে, কত পাপই অর্জে ছিলাম মা, কাচ্চা হক বাচ্চা হক অভাগীর কোলে একটা কিছু দে মা, ভিটে বাতির নিদর্শন থাক।"[৩১]

সেই লোকবিশ্বাস শেষপর্যন্ত স্বপ্নের মাধ্যমে সত্যতায় পরিণত হয়। গল্পে দেখা যায় মা-ষষ্ঠী সত্যি সত্যিই একরাতে স্বপ্নে দেখা দিলেন। দেখা দিয়ে বললেন—"উঠলো উঠ, তেল সিঁদুরে নাবি ধুবি, শশা পাবি শশা খাবি। কোলে পাবি সোনার পুত বুকজুড়ানো মাণিকটুক।"[৩২] আবার অলৌকিকভাবে কখনো কোনও ব্রাহ্মণ, পুরোহিত অথবা কবিরাজের দেখা পাওয়া যায়। এই গল্পেও দেখা যায় যে, একশো বছরের এক বুড়ি কাঠুরিয়ার বউকে একটি মন্ত্রপড়া শশা খেতে দেয়। এই শশা খেলে তার গর্ভে সন্তান আসবে। শশা দিয়ে বুড়ি বলে—"এই নে বাছা, এইটে নিয়ে বউকে দিস, কিছু যেন ফেলেনা, সাতদিন পরে যেন খায়, চাঁদপানা টলটল হাতী হেন ছেলেটা কোলজোড়া-ঘর আলো করবে।"[৩৩] এই ধরনের বিশ্বাস আমাদের বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

'মধুমালা' গল্পে আমরা একটি রাজকীয় পরিবেশের পরিচয় পাই। রাজা সন্তানহীন আঁটকুড়ে। আমাদের সমাজে আঁটকুড়ে মানুষের যত সম্পদই থাক না কেন কেউ তাকে পছন্দ

করে না। এমনকি কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠে তার দর্শন প্রত্যাশা করে না। কারণ তার মুখ দেখলে তার সারাদিনটাই অমঙ্গলে কাটবে। এ নিয়ে রাজার চিন্তার শেষ নেই। বরুণকুমার চক্রবর্তী বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরেছেন—

> রূপকথার শুরুতেই দেখি রাজা বিষণ্ণ কেননা তিনি সন্তানহীন। রাজবাড়ির নিম্নপদের কর্মীরাও রাজার মুখ সকালে দেখে না, কেননা আঁটকুড়ো রাজার মুখ দেখলে সারাটা দিন খারাপ যাবে। মর্যাদাহত রাজা সিদ্ধান্ত নেন, তিনি বনবাসী হবেন, রাজত্বে আর তাঁর কাজ নেই। কিন্তু সত্য সত্যই আর তাঁর রাজত্ব ত্যাগ করা হয়ে ওঠে না; কেননা ইতিমধ্যে কোনো সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে যায়, যিনি রাজাকে আশ্বস্ত করেন তাঁর সন্তানলাভের ব্যাপারে। সন্ন্যাসী রাজার হাতে তুলে দেন একটি শিকড় বা একটি ফল কিংবা একটি পাখি। সন্ন্যাসীর পরামর্শ মতো রানিদের সেই শিকড় বা ফল কিংবা পাখির মাংস খাওয়ানো হয়, তাঁরা সন্তানসম্ভবা হন। রাজার মনস্কামনা চরিতার্থতা লাভ করে।[৩৪]

কাহিনিতে দেখি একসময় মধুমালার সঙ্গে মদনকুমারের পরিচয় হয়। পরিচয়ের সূত্রে প্রণয় এবং সেই প্রণয় শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে গড়ায়। তাদের পরিণয়কে গল্পে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে—দু'জনে হেসে উঠলেন।

তখন মধুমালা বললেন, "দেখ কুমার, সমুদ্রের গাড়ি সোনারপুরী, সাত-ছত্রিশ-তের কুঠরীপার বিধাতা তোমাকে মিলিয়েছেন, তখন রাজপুত্র! তুমি ভিন্ন আর আমার স্বামী নাই। এই হাতের অঙ্গুরী তুমি পর, তোমার অঙ্গুরী আমাকে দাও।" কন্যা-কুমার উঠে দাঁড়ালেন; দু'জনার অঙ্গুরী দু'জনে নিলেন ঘুমের চোখে শুক শারী 'উল' বলে উঠল। মদন বললেন—"রাজকন্যা, অঙ্গুরী যদি নিলে, তোমার গায়ের চাদর আমাকে দাও, আমার চাদর তুমি নাও।"[৩৫] মালা বিনিময়ের মাধ্যমে গান্ধর্ব মতে বিয়ের দৃশ্য আমরা এই গল্পে দেখি। মধুমালা স্বামীকে বরণডালা দিয়ে আনন্দিত চিত্তে বরণ করে নিলো। গল্পে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে—অমৃত-নয়নী রাজকন্যা চন্দ্রকলা, আশে পাশে ধাই দাসী, বরণ ডালা ফুলের মালা নিয়েছিলেন। "মধুমালা, মধুমালা' শুনে দিক উজ্জ্বল করে এসে মদনকুমারের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। বললেন, "বাবা! আজ হইতে তোমার দায় গেল, আমি যাঁর আমি তাঁর হলম; ধন যৌতুক তোমার জামাইকে কি দিবে, সাজিয়ে দাও।[৩৬]

'পুষ্পমালা' গল্পের কাহিনিতে রাজা, রাজকন্যা ও কোটালের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিঃসন্তান রাজা ও আঁটকুড়ে কোটালের কাহিনিকে উপজীব্য করেই মূলত এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। দুইজনের স্ত্রীই একদিন তিন সত্য করে যে যদি আমার ঘরে ছেলে আর তোর ঘরে মেয়ে হয় তবে দুজনের সঙ্গে বিয়ে দেব। কিন্তু একথা শুনে কোটালের স্ত্রী ভয় পেয়ে গেল। রানির শক্ত করে ধরাতে সেও তিন সত্য করলো। লেখক বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরেছেন—

> তখন রানি কোটালিনী, দুইজনে স্নান করিয়া, তিন সত্য শপথ করিয়া, দুই ঘাটের দুই পদ্মফুল ছিঁড়িয়া ভাসাইয়া দিলেন। ঢেউয়ে দুই পদ্ম গিয়া একত্র হইল। দুইজনে উলু দিয়া উঠিলেন। যে যা'র ঘরে গেলেন। এ কথা আর কেহই জানিল না।[৩৭]

বাঙালি নারীর তেজদীপ্ততার পরিচয় পুষ্পমালা চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। পুষ্পমালা সহজ, সরল অবলা বাঙালি নারীকে পাশ কাটিয়ে নিজের স্বতন্ত্র জগত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সে ডাকাতদের সঙ্গে কৌশলে যুদ্ধ করেছে। ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধের বর্ণনায় গল্পে

বলা হয়েছে—"অনিচ্ছায় কন্যা নামলেন। অমনি পিছন থেকে লাফ দিয়ে তরোয়াল নিয়ে এক কোপে কুমারের মাথা কেটে ফেলে ঘোড়ার উপর ঘেসেড়া বসল।"[৩৮]

প্রকৃতির সঙ্গে নারীর রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রকৃতিই যেন নারীকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে গল্পে বলা হয়েছে—পুষ্প কাঁদেন, নদীর জল কাঁদে, বনের পশুপাখি বনতরু; কাঁদে পাথর পাষাণ ফাটে! কান্নায় বনপুরী ছেয়ে দিন গেল, ভীষণ-আঁধার রাত এল। সেই আঁধার রাতে, শিব-পার্বতী কৈলাশে যান। আকাশের তারা, পাতালের বালু গণিতে গণিতে দুই দেবতা চলিয়াছেন। পার্বতী বলেন, "দেবতা কার যেন রোদন শুনি!" যার দুঃখ তার, ওসবে আমাদের কাজ কি-চল।" পার্বতী বলেন—"না না দেবতা। কোন অভাগী পতিহারা, কোন জননী পুত্রছাড়া, তা না দেখলে প্রাণ মানে না।"[৩৯]

এভাবে নানা গল্পে আমরা একে অপরের ক্ষতি করার নানা দৃষ্টান্ত দেখি। এর পেছনে অবশ্য অনেকগুলো কারণ কাজ করে। আর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তারা নানামাত্রিক ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। শহীদুর রহমান বিষয়টাকে এভাবে দেখেন—

> পৃথিবীতে কোনো কোনো মানুষ আপন ঈর্ষায় অপরের ক্ষতি সাধন করে থাকে। তারা অনেক সময় প্রত্যক্ষ প্রতিশোধ না নিয়ে পরোক্ষভাবে যাদুমন্ত্রের সাহায্যে অপরের অনিষ্ট করে। বাঙালি সমাজেও এমন প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে অনুভূত হয় যে, বাঙালি সমাজে এসব এসেছে বহু গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের রক্তমিশ্রণের ফলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্প্রদায় একত্রে মিলিত হবার ফলে তাদের পরিচর্যিত সংস্কার-সংস্কৃতির অনেককিছুই ঐতিহ্যগতভাবে সমন্বিত ও প্রচলিত হয়েছে এ সমাজে।[৪০]

সতী নারীর গুণগান সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই করে আসা হচ্ছে। নারী যদি সতী থাকে তাহলে তার উপরে কোনো তন্ত্রমন্ত্রই প্রভাব ফেলতে পারে না। গল্পে সেরকমই ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে—"সতীর তেজ, পুষ্পের কিছু হইল না; পলকে চন্দন মস্ত-দাড়ী ছাগল হইয়া মালিনীর পিছু নিলেন!"[৪১]

'মালঞ্চমালা' গল্পে দেখি জ্যোতিষ গণনার উপর নির্ভরশীলতার চিত্র। এটিও বাঙালি নারী-পুরুষ সকলের মজ্জাগত বিশ্বাস। এ থেকে নারী পুরুষ কেউই বেরিয়ে আসতে পারেনি। এবং এই কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় এমন অবিশ্বাস্য কিছু করা হয় যা বর্তমান সময়ে হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু সমকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে বিষয়গুলো একেবারেই প্রাসঙ্গিক। সেরকম একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে; যেখানে বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে সাতদিনের ছেলের বিয়ের কথা বলা হয়—

> ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের মুখ দেখলেন, হাত দেখলেন, কপালের রেখা দেখলেন। দেখে বললেন, "মহারাজ! এ আয়ু তবেই খন্ডিবে-বারো বৎসরের কন্যার সঙ্গে যদি এই সাতদিনের ছেলের বিবাহ দিতে পারেন। মহারাজ আমি চললাম।[৪২]

লক্ষণীয় বিষয় যে এসব গল্পে কেবল পুত্রের বয়স কম থাকে। আর কন্যার বয়স বারো বছর দেখানো হয়। এর পেছনে অন্যতম কারণ একজন বারো বছর বয়সের কন্যা সাত দিনের পুত্রকে মাতৃস্নেহে বড় করে তুলতে পারবেন। কিন্তু যদি এর উল্টো হয় তবে কন্যার মৃত্যু অবধারিত।

বাংলা লোককথা বাঙালি নিত্যদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নির্যাস। আর এই অভিজ্ঞতা যাকে কেন্দ্র করে বারবার আবর্তিত হয়েছে তিনি হলেন নারী। কারণ নারীই প্রথম এগুলো সৃষ্ট করেছেন এবং বংশ পরম্পরায় কোনোপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা বা লাভের আশা ছাড়াই এর অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন। এগুলো যেহেতু আমাদের সমাজ জীবনের নানা অনুষঙ্গকে উপজীব্য করে রচিত, তাই নারীও এগুলোকে দেখে এসেছে নিজেদের চোখের পরিবর্তে পুরুষের দেখিয়ে দেওয়া চোখ দিয়ে। তাই এসব লোককথায় আমরা সেসব নারীকেই বেশির ভাগ দেখি যারা আমাদের চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই লোককথায় নারী প্রসঙ্গটি খুবই প্রাসঙ্গিক রূপ লাভ করেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. দিব্যজ্যোতি মজুমদার : 'বাংলা লোককথার বিভিন্ন ভাগ এবং টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স', বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, গাংচিল, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮১
২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১
৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'রূপকথার প্রসঙ্গ', লোককথার সাতকাহন, বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১১
৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩
৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ১২
৬. জসীমউদ্দীন : 'গোপ্যার বউ', বাঙালীর হাসির গল্প, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩
৭. জসীমউদ্দীন : 'আয়না', বাঙালীর হাসির গল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭
৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮
১০. সুব্রত চক্রবর্তী : 'লৌকিক হাসির গল্প', লোককথার সাতকাহন, বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত : পৃ. ৬১
১১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬
১২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬২
১৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯
১৪. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'কলাবতী রাজকন্যা', ঠাকুরমার ঝুলি, ষষ্ঠচত্বারিংশৎ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন্‌স, কলকাতা, পৃ. ৩২
১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩২
১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩০
১৭. মো. শহীদুর রহমান : 'বাংলা লোককথায় পেশা সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ', সমাচার, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৩
১৮. প্রাগুক্ত : 'পৃ. ৪৮
১৯. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'ঘুমন্তপুরী', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
২০. তদেব : 'কাঞ্চনমালা', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
২১. তদেব : 'সাতভাইচম্পা', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
২২. তদেব : 'শীত বসন্ত', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

২৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮২
২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৪
২৫. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'কিরণমালা', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
২৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'লোককথার সাতকাহন', অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৪
২৭. মো. শহীদুর রহমান : 'বাংলা লোককথায় পেশা সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ', সমাচার, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৮
২৮. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮
২৯. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'সুখু আর দুখু', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮
৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮৮-৮৯
৩১. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'দেড় আঙ্গুলে', ঠাকুরমার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮
৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ২০৮-০৯
৩৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২০৯
৩৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'লোককথার সাতকাহন', অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩
৩৫. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'মধুমালা', ঠাকুরদাদার ঝুলি, সপ্তদশ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন্স, ১৩৩৮, কলকাতা, পৃ. ৬৯
৩৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৪
৩৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৪
৩৮. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'পুষ্পমালা', ঠাকুরদাদার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০
৩৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩৩
৪০. মো. শহীদুর রহমান : 'বাংলা লোককথায় পেশা সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ', সমাচার, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬৯
৪১. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'পুষ্পমালা', ঠাকুরদাদার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
৪২. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার : 'মালঞ্চমালা', ঠাকুরদাদার ঝুলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩